অবনীন্দ্রনাথের ভোজনরসিকতা

প্রীতম গোস্বামী

পাঁচ নম্বর জোড়াসাঁকো বাড়ীর অবন ঠাকুরের রবিকা(বিশ্বকবি রবীন্দ্রনাথ ঠাকুর) তাঁর ‘নিমন্ত্রণ কবিতায় লিখেছিলেন ‘জেনো বাসনার সেরা বাসা রসনায়’। ঠাকুরবাড়ীর রসিকদের অসামান্য রসচয়ন বৈচিত্র্যে রসনারসও গুরুত্ব পেয়েছিল সমানভাবে। ৫ নং জোড়াসাঁকোর বাড়ীর বৈষ্ণব হিন্দু ঠাকুরদের আর ৬ নং বাড়ীর ব্রাহ্ম ঠাকুরদের পূর্বপুরুষ প্রিন্স দ্বারকানাথ ঠাকুর তাঁর বেলগাছিয়া ভিলায় ছুরি কাঁটার ঝনঝনি তুলে আর ফ্রান্সে তাঁর বিখ্যাত ভোজে ক্যাভিয়ার, মাংস ও গলদা চিংড়ির পর্বত সৃষ্টি করে অগাধ বিস্ময় সৃষ্টি করেছিলেন যুগপৎ কোলকাতায় ও সাহেবদের দেশে। কিন্তু দ্বারকানাথের এই ভোজ-উৎসবে বৈভবের আস্ফালন যতটা ছিল শিল্পরুচি ছিল না সেই অনুপাতে। দ্বারকানাথের পরবর্তী প্রজন্ম দেবেন্দ্রনাথের সময় খাদ্যবস্তুতে ও খাদ্যগ্রহণে যুগপৎ শৌখিনতা আবার একপ্রকার সাত্ত্বিক সারল্য দেখা যায় যার বর্ণনা আমরা পাই সৌদামিনী দেবী, রবীন্দ্রনাথ, অবনীন্দ্রনাথ ও শেষে সুভগেন্দ্রনাথ ঠাকুরের রচনায়। কিন্তু দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুর পরবর্তী প্রজন্মের হাত ধরেই আমরা রন্ধন ও ভোজনসংস্কৃতিকে ঠাকুরবাড়ীতে সূক্ষ্মকলায় পরিণত হয়ে উঠতে দেখি। ঠাকুরবাবুরা ও ঠাকুরবাড়ীর মহিলারা রন্ধন ও আহার বিষয়ে চিন্তা করে, রান্না বিষয়ে নানাপ্রকার পরীক্ষা-নিরীক্ষার মাধ্যমে, পৃথিবীর বিভিন্ন স্থানের রান্না ও রসুইকরদের আনিয়ে, রন্ধন বিষয়ে বই লিখে এমনকি খাদ্যের ইতিহাস নিয়েও গভীর চর্চা করে ‘রান্না-খাওয়া’র বিষয়টিকে একদিকে দিনযাপন ও অন্যদিকে বিলাসিতার ও প্রাচুর্যের আড়ম্বর প্রদর্শনের জায়গা থেকে শিল্পের পর্যায়ে নিয়ে যান। ৬ নং বাড়ীতে এই কাজ করেন মূলতঃ হেমেন্দ্রনাথ, জ্যোতিরিন্দ্রনাথ, রবীন্দ্রনাথ, ঋতেন্দ্রনাথ ও প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবী এবং ৫ নং বাড়ীতে গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ।

৫ নং বাড়ীর ঠাকুরবাবুদের ভোজনরসিকতার ব্যাপারে জানার একটি সমস্যা হল এ ব্যাপারে তথ্যসূত্রের সমস্যা। ৬ নং বাড়ীর ব্যাপারে

আলোচনার জন্য যে প্রভূত রচনা আমরা পাই ৫ নং বাড়ীর সেইপ্রকার অন্তরঙ্গ চিত্র পাওয়ার ক্ষেত্রে তার সংখ্যা অনেকাংশেই সীমিত। ঠাকুর বাবুদের বিশেষ করে অবন ঠাকুরের ভোজনরসিক মনটিকে ছোঁয়ার জন্য যে সকল গ্রন্থের ও রচনার ওপর আমাদের মূলতঃ নির্ভর করতে হবে সেগুলি হল অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরের স্মৃতিকথামূলক 'আপন কথা', 'ঘরো্য়া' ও 'জোড়াসাঁকোর ধারে', অবনীন্দ্রনাথের বড়ো মেয়ে উমা দেবীর 'বাবার কথা', অবনীন্দ্রপুত্র অলোকেন্দ্রনাথের সংক্ষিপ্ত পিতৃজীবনী 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর',গগনেন্দ্রনাথপুত্রী পূর্ণিমা দেবীর 'ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর', মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের 'দক্ষিণের বারান্দা' ও 'গগনেন্দ্রনাথ', অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের আত্মজৈবনিক 'অমিতকথা', সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুরের, 'ঠাকুরবাড়ীর জানা অজানা' চিত্রকর মুকুল দের 'আমার কথা' ও পল্লীকবি জসীমউদ্দীনের 'ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনায়'। এছাড়া অবনীন্দ্রনাথের ভোজনরসিক মনটির খোঁজ পেতে হলে আমাদের তাঁর সেই অতুলনীয় সাহিত্যগুলির মধ্যেও নিমজ্জিত হতে হবে। 'শকুন্তলা', 'নালক, 'ক্ষীরের পুতুল', 'মাসি' এবং অদ্বিতীয় 'ভূতপতরীর দেশ' সবই আমাদের সহায়ক হয়ে দেখা দেবে।

৫নেং ঠাকুরবাড়ির ছোটকর্তা ছিলেন আর্টিস্ট। যা করেছেন তাই হয়েছে ছবি। তাঁর রান্না ও খাওয়ার মধ্যেও কোথাও ঔদরিকতা, আড়ম্বর কিম্বা দিনযাপনের নিত্যনৈমিত্তিকতার প্রয়োজন আর্টিস্ট এর উপভোগ আর রসগ্রহণের ক্ষেত্রটিকে ব্যাহত করেনি। কানাইলাল ঠাকুর, জগমোহন গাঙ্গুলী প্রমুখ 'সেকালের' শৌখিনদের পোষাকি মাছ কিম্বা রান্নার শখের কথা বলতে গিয়ে তাঁর স্মৃতিকথায় অবনীন্দ্রনাথ বারবার আক্ষেপ করেছেন 'এখনকার' লোকেদের 'শখে'র অভাবের জন্য। তাঁর স্মৃতিকথায় বাল্য আর যৌবনকালের খাওয়ার, ভোজের আবার ঠাকুরবাড়ীর অন্য কর্তাদের খাওয়ার বিচিত্র শখের যে চিত্রসম বর্ণনা আছে আর তারই পরিপূরক স্বরূপ আমরা পেয়েছি তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়ের স্মৃতিকথাগুলি যাতে আছে পরিণত প্রবীণ অবন ঠাকুরের দৈনন্দিন ভোজনরীতি ও ভোজনপ্রীতি, রন্ধন নিয়ে নানা পরীক্ষানিরীক্ষা ও রান্নার মাধ্যমে তাঁর শিল্পীসত্তার আরেকটি দিকের প্রকাশের বিবরণ।

বালক অবনীন্দ্রনাথ তাঁর 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র বর্ণনা প্রায় শুরুই করেছেন এক বৃষ্টির দিনের মধ্যে যেখানে ভাতে ভাত আর ভাজা মাছ রান্না হচ্ছে বৃষ্টির দিনের সাথে তাল মিলিয়ে। 'ফুটো ছাত, ভাতে ভাত, ভাজো মাছ' অবনীন্দ্রনাথের নিজস্ব কাব্যজগতের প্রায় প্রথম বাক্য তাঁর

রবিকার 'জল পড়ে, পাতা নড়ের' মতোই। আর এই মাছ যেখানে ভাজা হত সেই রান্নাবাড়ীর বর্ণনাও আছে তাঁর স্মৃতিতে। চাকর মহলের মাঝে গলির মাঝে সেই ছোট ঘর যেখানে অমৃত দাসী সারাদিন জাঁতায় ডাল ভাঙে আর বাটনা বাটে আর সোনার বর্ণ সোনামুগের ডাল জাঁতার চারদিক থেকে সোনার ঝরণার মত ঝরে পড়ে। স্কুল পালানো ছেলে অবন ঠাকুর সেখানে এসে দাঁড়ালেই অমৃত দাসী হাতে তুলে দিত একমুঠো ভিজে ডাল। আর এই স্কুল পালানোও যে এক খাবারকে নিয়েই।'Pudding' যা কিনা পুডিং বলে বাড়ীতে নিত্য খেত বালক অবন ঠাকুর তাকে মাস্টারমশাই- এর জেদের কাছে মাথা নুইয়ে পাডিং বলতে না চাওয়ায় অবনকে পেতে হয় মাস্টারের হৃদয়হীন নির্মম শাস্তি। আর শিক্ষার এই বিচিত্র রকম দেখেই ৫ নং বাড়ির তখনকার কর্তা গুণেন্দ্রনাথ তাঁর ছোট ছেলের স্কুলে যাওয়া বারণ করে দেন। স্কুলে না গিয়ে বেঁচে গিয়েও কিন্তু স্কুলের দু একটা জন্য মন কেমন করত বালক অবনের। আর তার মধ্যে একটা সেরা জিনিস ছিল প্রতাপের দোকানের লাল, সবুজ, হলুদ লজেঞ্চুস। ৬ নং বাড়ির মাঘোৎসবের দিনটা খুব প্রিয় ছিল অবনের কাছে। তার প্রধান কারণ মাঘোৎসবের সেই বিখ্যাত ভোজ যাতে তিনতলা থেকে একতলা অবধি পাত পড়ত আর অপর্যাপ্ত আয়োজন থাকত পোলাও আর ছোট ছোট কামানের গোলার মত বড় মিঠাই–এর (মাঘোৎসবের এই বিশালকায় মিঠাই–এর বর্ণনা আমরা পাই রবীন্দ্রনাথের বড়দিদি সৌদামিনী দেবীর 'পিতৃস্মৃতি'তেও)। পরিণত বয়স্ক অবনীন্দ্রনাথের ধারণা সে সময়ের বেশিরভাগ অতিথিই বালক অবনের মত কেবল মাঘোৎসবের এই ভোজের লোভেই আসত উৎসবে। উৎসবের পরের দিন কর্তাদিদিমা (মহর্ষিজায়া সারদা দেবী) বাচ্চাদের খাওয়ার জন্য ৫ নং বাড়িতে আবার পাঠিয়ে দিতেন এক থালা সেই প্রকাণ্ড মিঠাই যা বালক অবনের কাছে উৎসবের আনন্দকে করে তুলত দ্বিগুণ। আবার এই সবের পাশাপাশি বালক অবন দেখে আলোকপ্রাপ্ত, সংস্কার ভাঙার লীলাক্ষেত্র ঠাকুরবাড়িতে খাওয়া-ছোঁওয়া নিয়ে অদ্ভুত সংস্কার। বাড়ীতে নিমন্ত্রিত একজন ইউরোপীয় সাহেবের পাত থেকে মাখন মাখানো গোল রুটি নিয়ে খেয়ে ফেললে বাড়ির বড়দের কাছ থেকে শুনতে হয় যে বালক অবন 'ব্যাপটাইজ' (baptized) হয়ে গেছে। বাড়ীর দারোয়ান থেকে ছোট বোনেরা তার ছোঁয়া অপবিত্র জ্ঞান করে। শেষে ছোটপিসির কাছে ঠাকুর ঘরে গিয়ে পঞ্চগব্য আর গঙ্গাজলে নিজেকে শোধন করতে হয়। সংস্কারমুক্ত ঠাকুরবাড়ির অন্দরে ছুৎমার্গের এক অদ্ভুত দৃষ্টান্ত। অবশ্য

এই সুযোগেই পাঠকের দেখা হয়ে যায় ৫ নং বাড়ীর বৈষ্ণব ঠাকুরঘরের নিজস্ব হেঁসেলটি আর সেখানকার সেই পায়েস, ভাজাভুজি ইত্যাদির আলাদা আলাদা প্রকাণ্ড চুল্লীগুলি।

যুবক অবনীন্দ্রনাথ সরাসরি নিজেকে উল্লেখ করেছেন খাইয়ে বলে আর জানিয়েছেন যে এ ব্যাপারে তিনি দীপুদার (দ্বিজেন্দ্রনাথ ঠাকুরের জ্যেষ্ঠপুত্র দ্বীপেন্দ্রনাথ) চ্যালা। বিভিন্ন বর্ণনায় এই ভোজনরসিকতার বর্ণনা আছে পুরোমাত্রায়। ড্রামাটিক ক্লাব উঠে যাওয়া উপলক্ষে ক্লাবের যে 'শ্রাদ্ধবাসরের ভোজ' আয়োজিত হয় তাতে 'নিয়োপলিটান ক্রিম' (Neapolitan cream) আর মাটন চপের ব্যবস্থা হয়েছিল (যার হাড়গোড়গুলো নাকি হাতির দাঁতের চুষিকাঠির মত হয়ে উঠেছিল) তার অত্যন্ত সরস বর্ণনা রয়েছে ঘরোয়ায়। রবীন্দ্রনাথের সঙ্গে নাটোরে কংগ্রেসের প্রভিন্সিয়াল কনফারেন্সে (provincial conference) গিয়ে অবন আর দ্বিপেন্দ্রনাথ স্টিমারে আয়োজিত ভোজে বসে এক পেটুক ব্যক্তির কল্যাণে 'খাইয়ে' অবন যথেষ্ট পরিমাণে কাটলেট ও পুডিং থেকে বঞ্চিত অবন যথেষ্ট উষ্মা প্রকাশ করেন বৃদ্ধ বয়েসেও। আবার তাঁরই ঠাণ্ডা সন্দেশ নিয়ে রসিকতার জবাব দিতে নাটোর (মহারাজ জগদিন্দ্রনাথ রায়) জগদীন্দ্রনাথ ডাইনিং হলেই হালুইকর বসিয়ে দেন অতিথিদের পাতে গরমগরম সন্দেশ তুলে দেওয়ার জন্য। 'খামখেয়ালী সভা'র বিলাতফেরৎ বন্ধুর বাগানবাড়িতে প্যাটী ও অন্যান্য বিলিতি খাদ্যের আশা নিয়ে গিয়ে 'মুদির দোকান থেকে ধরে আনা বামুনের রান্না' লুচি ও পাঁঠার ঝোল খেয়ে অবনসহ খামখেয়ালি সভার সদস্যদের বিরক্তি ও সেই সামগ্রিক অনুষ্ঠানের অত্যন্ত 'depressing' অভিজ্ঞতার ফলে খামখেয়ালি সভা উঠে যাওয়ার কথাও অবন বর্ণনা করেছেন সরসভাবে।

অবন যে শুধু নিজের ভোজনরসিকতা বর্ণনা করেছেন তাই নয় আশেপাশের বিভিন্ন মানুষের আহাররীতিরও সরস বর্ণনা করেছেন। মহর্ষি দেবেন্দ্রনাথ ঠাকুরের ভারী কাঁচের বাটিতে অঞ্জলিবদ্ধ ভাবে দুধপান, ক্ষীর ও পায়েসের প্রতি আসক্তি, এবং ব্রাহ্মভ্রাতাদের নিজের হাতে পায়সান্ন রান্না করে খাওয়ানোর মনোগ্রাহী বিবরণ দিয়েছেন তিনি। এব্যাপারে সবচেয়ে আকর্ষণীয় বর্ণনা তিনি দিয়েছেন ১৯০২ সালে মহর্ষিদেবের দার্জিলিং ভ্রমণের। এই সময় অশক্ত শরীরেও পাহাড়ে মহর্ষির আহার ছিল এক দিস্তা হাতে গড়া রুটি, বড় বাটি ভরা অড়হড় ডাল ও ছোট একবাটি গলানো ঘি যা সঙ্গী দ্বীপেন্দ্রনাথকে ভয় পাইয়ে দিয়েছিল। কিন্তু মহর্ষি পাহাড় থেকে নেমে আসেন সুস্থ শরীরেই। অবনীন্দ্রনাথের

এই স্মৃতিচারণে শুধু যে তাঁর নিজের ভোজনরসিক মনটি ধরা পড়েছে সুন্দরভাবে তাই নয় ঠাকুরবাড়ির বেশ কিছু সদস্যের ভোজনরীতি ও শৌখিনতার চিত্রটিও ধরা পড়েছে।

গগনেন্দ্র, সমরেন্দ্র ও অবনীন্দ্রনাথের খাদ্যাভ্যাস, খাদ্য ও রন্ধনের বিচিত্র শৌখিনতা ও বিচিত্রতর উদ্ভাবন যা সর্বদাই সংযুক্ত ছিল তাঁদের শিল্পবোধ ও রসদৃষ্টির সঙ্গে তা সবচেয়ে বিস্তৃত বিবরণ দিয়েছেন তাঁর দৌহিত্র মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়। ঠাকুরবাবুদের বাড়িতে দুপুরের খাওয়া শুরু হত এগারোটা নাগাদ। তাঁরা খেতেন পশমের আসনে বসে, পাথরের থালায়, পাথরের বাটিতে, রূপোর বাটিতে, রূপোর গেলাসে। দুপুর বেলাকার পাচক ছিল দুর্গাদাস ঠাকুর ও দিনু ঠাকুর যাদের মধ্যে মাংস রান্না করে বাবুদের খুশি করা নিয়ে চলত প্রতিযোগিতা। এছাড়াও সেই হেঁসেলে প্রায়ই যে পদগুলি হত তা হল সুক্তো, ঘন সোনামুগের ডাল, পাকা রুইয়ের কালিয়া ইত্যাদি। গৃহদেবতা লক্ষ্মীজনার্দনের ভোগ প্রস্তুতের দায়িত্বে থাকতেন মানিক ঠাকুর। এই ভোগের প্রসাদ মূলতঃ গুণেন্দ্রনাথ পত্নী সৌদামিনী দেবী গ্রহণ করলেও তিন ঠাকুর কর্তাও মাঝেমাঝেই গ্রহণ করতেন। অবনীন্দ্র দুহিতা উমা দেবীর স্মৃতিকথায় জানতে পারি যে খুব সকালে অবনীন্দ্র মায়ের হাতে ঢালা ফেনা সুদ্ধ দুধ রুপোর বাটিতে অঞ্জলি করে খেতেন। সেই বাটি নিয়ে আসত অবিনাশ বেয়ারা। আটটার সময় নবীন বাবুর্চি টোস্ট ও ডিমসেদ্ধ এনে রাখত তিন বাবুদের সামনে ট্রেতে। তাঁরা আগে কাককে খাইয়ে পরে নিজেরা খেতেন। দুপুরের খাওয়া অল্প বয়সে তাঁরা সবসময়েই করতে পছন্দ করতেন মা সৌদামিনীর সামনে। বেলা তিনটের সময় নীলু চাকর তাঁদের ডাব খাইয়ে যেত। আর পাঁচটার পর গগনেন্দ্র পত্নী প্রমোদকুমারী তিন ভাইয়ের জন্য ফল, মিষ্টান্ন, নোনতা খাবার ইত্যাদি জলযোগের ব্যবস্থা করতেন। দিনে বামুন ঠাকুরের রান্না খেলেও রাত্রে তাঁদের রান্না আসত বাবুর্চিখানা থেকে(৫নং বৈঠকখানা বাড়িতে এই বাবুর্চিখানা প্রতিষ্ঠা করেন দ্বারকানাথ ঠাকুর। যে কারণে পাথুরিয়াঘাটার ঠাকুররা জোড়াসাঁকোর ঠাকুরদের ‘পেঁয়াজ রসুন খাওয়া মেছোবাজারের ঠাকুর’ বলে ডাকতে শুরু করেন) যা পরিচালনের দায়িত্বে প্রথমত ছিলেন একজন মগ রাঁধুনী। মূলতঃ তিনটি ডিশ প্রস্তুত হত যার মধ্যে একটা অবশ্যই থাকত পুডিং। কিন্তু এই বিলিতি ডিশের সাথে আবার কতগুলি লুচি না হলে তাঁদের মনঃপুত হত না। মগ রাঁধুনী বিদায় নেওয়ার পর দীর্ঘদিন ৫ নং বাড়ির বাবুর্চীখানার দায়িত্বে ছিল নবীন চাকর। নবীনের পর ঐ কাজে বহাল হয় নবীনের মেট বা শাগরেদ

তালাবালি। অবনের নিজের ভাষায় নবীন ছিল বড় বড় পার্টি দেওয়ার বাবুর্চী। টেবিল সাজিয়ে, ছুরি, কাঁটা, প্লেট সাজিয়ে পুরোদস্তুর সাহেবি কায়দায় ভোজ খেতে হলে দরকার ছিল নবীনের মতো বাবুর্চি। আর নিজেদের পরিচিত জন নিয়ে ঘরোয়া ভাবে রসিয়ে রসিয়ে মোগলাই বা সাহেবি খানা খেতে হলে তালাবালিই উপযুক্ত বাবুর্চী। তালাবালি তার দেশ গ্রামে গিয়ে মারা গেলে তার জায়গা নেয় অবনীন্দ্রনাথের খাস চাকর রাধু। রাধু প্রথমে রসুইখানা থেকে তালাবালি বাটি ভরে মুরগি স্টু এবং পুডিং ইত্যাদি তারাকাটা বোম্বাই কাচের প্লেটে সাজিয়ে দিলে তা বাবুদের কাছে নিয়ে আসত। তালাবালির মৃত্যুর পর সে রান্না ও পরিবেশন দুইয়েরই দায়িত্ব পায়। রাধু তালাবালির কাছে রান্না শিখলেও তার প্রধান গুরু ছিলেন অবনীন্দ্রনাথ স্বয়ং। রাধু যেদিন তালাবালির তৈরি জেলি 'যাতে লেবুটা কাটলে অর্ধেক শাদা বেরোয়' সেই জেলি তৈরিতে অকৃতকার্যতা জানায় সেদিন অবনীন্দ্রনাথ তাকে orange bloom তৈরি শেখাতে গিয়ে রন্ধনবিদ্যা নিয়ে পড়াশোনা শুরু করেন। Mrs. Beeton's Book of Household Management: A Guide to Cookery in All Branches বইটি এই রন্ধন বিদ্যা শেখার ব্যাপারে অবনীন্দ্রনাথের প্রধান অবলম্বন ছিল। এছাড়াও তিনি প্রজ্ঞাসুন্দরী দেবীর 'আমিষ ও নিরামিষ আহার', সতীশচন্দ্র মুখোপাধায় সম্পাদিত 'হাজার জিনিস' বইয়ে রান্নার অধ্যায়, রান্নার বিভিন্ন 'মুসলমানী কেতাব' ইত্যাদিও পাঠ করতে থাকেন নিয়মিত। বরফে জমানো কর্নফ্লেক্স পুডিং(corn flex pudding , যাকে রাধু উল্লেখ করেছিল জেলি বলে)তা শেখানোর পর রাধুকে আরো বিভিন্ন রান্না শেখান অবনীন্দ্রনাথ, তার রান্নার তদারকি করতেন নিজে দাঁড়িয়ে। দীর্ঘ শিক্ষানবিশী করিয়ে রাধু ক্রমে ওস্তাদ রাঁধুনীতে পরিণত হয়। রাধুর শিক্ষানবিশী সম্বন্ধে অবনীন্দ্রনাথ বলেন যে রান্না হল খাওয়ার মতই 'আপ-রুচি', 'পর- রুচি' নয়। যত বড় গুরুর কাছেই শেখা হোক নয়া কোনো ওস্তাদ রসুয়ের নিজের হাতের তার রান্নায় ফুটে বেরোবেই। হাজার লোকের ভোজের জন্য হাতা-বেড়ি ধরলেও রাঁধুনী জানে রান্না আসলে তার নিজের জন্য। মনের মতো না হলে রান্নাই হল না। নবীন, তালাবালি, রাধু সবাই এই জাতের রাঁধিয়ে। সর্বশিল্পের শিল্পীদের ব্যাপারে এই মূল কথার সাথে রাধুর যোগ থেকে যায়।

ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের নিয়েও অবনীন্দ্রনাথ খোলেন তাঁর রান্নার ক্লাস। মোহনলাল, শোভনলাল ও অন্যান্যরা তাঁর উৎসাহে শুরু করেন রান্নার ক্লাস তাঁদের দক্ষিণের বারান্দার দোলনা বাগানের কাছে। সেখানে স্টোভ

জ্বালিয়ে তাঁরা শুরু করেন আলুভাজা তৈরি। নূতন উৎসাহে আলুর বড়া, ঝুরো; মিহি আলুভাজা থেকে, বিলাতি পোট্যাটো চিপস, ফরাসি সেতো প্রভৃতির সাথে বিচিত্ররূপে মিল নানা বিচিত্র আলুভাজা তাঁরা বানিয়ে ফেলেন। যদিও এর ফলে হেঁসেলের মূল খাবার খাওয়া হতে থাকে কম এবং বাড়ির মেয়েদের আপত্তিতে রান্নার ক্লাস শীঘ্রই বন্ধ হয় কিন্তু এর রেশ থেকে যায় অনেকদিন। নিজের নাতি অমিতেন্দ্রনাথ বা বীরুবাবুকেও অবনীন্দ্র কবিতায় যে চিঠি লেখেন তাতেও আছে নানা খাবারের বর্ণনা ‘বীরুবাবু, রুটিটুটি কেকটেক খাইয়াছ/হীরেটিরে খুঁজেখাঁজে পাইয়াছ?/ মুর্গিটুর্গি ডিমটিম চলচে ঠিক?/পানটান খেয়ে টেয়ে ফেলচ পিক?’ এই সময়ই অবনীন্দ্রনাথ দীর্ঘ সময় ধরে রান্নার বিভিন্ন পরীক্ষানিরীক্ষা চালান যা ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের অত্যন্ত লোভনীয় হয়ে উঠেছিল। রান্নায় অবনীন্দ্রনাথ প্রচলিত প্রথাগুলি নিয়ে নানা বিচিত্র পরীক্ষা করেন। যেখানে পেঁয়াজ ভাজার কথা শেষে সেখানে ভাজতেন প্রথমে। যেখানে সাঁতলাবার কথা শেষে সেখানে মাছ তরকারি সাঁতলাতেন প্রথমে। ভাজার জায়গায় সিদ্ধ ও সিদ্ধে জায়গায় ভাজা এমনি নানা পরীক্ষা চলত। এইভাবে শেষে ‘মুর্গির মাছের ঝোল’ আর ‘মাছের মাংস কারী’ বানিয়ে ফেলেন। এই পরীক্ষা নিরীক্ষার শ্রেষ্ঠ উদাহরণ হচ্ছে কবিও জসীমউদ্দীনের প্রেসিডেন্ট পদ লাভের জন্য বানানো ‘জোসী কাবাব’। ৫ নং বাড়ির ছেলেদের এক ক্লাবে সভাপতি পদের দাবিদার হন কবি জসীম উদ্দীন। বাড়ির ছেলেরা দাবি জানান যে একদিন মনোমত খাওয়ার ব্যবস্থা না করলে তাঁরা জসীমউদ্দীনকে ভোট দেবেন না। জসীমউদ্দীন তাঁরা ‘গেঁয়োকবির গেঁয়োখাবারে’ আপত্তি করতে পারবেন না এই চুক্তিতে রাজি করিয়ে ছেলেদের নিয়ে ভালো ঘি, তেল, আলু, বেগুন, ময়দা, সুজি, কিসমিস, চিনি, বাদাম, দই, সন্দেশ ইত্যাদি কেনেন। রাধু চাকরের উপদেশমত ৫নং বাড়ির ছেলেরা নিজেরাই রান্না করেন। কিন্তু তাঁরা বলেন যে এই খাওয়ানো ঠাকুরবাড়ির ছেলেদের ক্লাবের সভাপতি হওয়ার উপযুক্ত হয়নি। জসীম উদ্দীনকে মনঃক্ষুণ্ণ দেখে অবনীন্দ্রনাথ তাঁরই রান্নার আয়োজনের অতিরিক্ত ময়দা, ঘি, সুজি ইত্যাদি দিইয়ে পরের দিন নিজে রান্না করেন গরমগরম ‘জোসী কাবাব’। মাথাপিছু একটার বেশি তা আর সেই অতিরিক্ত থেকে কুলানো যায় নি আর তা তৈরিও হয়েছিল ঐ একবারই কিন্তু তা চিরকাল ঠাকুরবাড়ির শুধু ছেলেরা নয় বড়দেরও রসনাস্মৃতিতে অমর ছিল।

অবনীন্দ্রনাথের এই খাদ্যরুচি, রন্ধন উৎসাহ ইত্যাদির যে যাবতীয়

ছবি আমরা পাই তার মধ্যে একপ্রকার সূক্ষ শৌখিনতার রুচি, অসাধারণ সৃজনীশক্তি আর অনুপম কল্পনাশক্তির মিলন ঘটেছে। তবে একথাও অনস্বীকার্য যে এই শৌখীনতার প্রয়োগ ততদিনই সম্ভব ছিল যতদিন ঠাকুর জমিদারির আয় অব্যাহত ছিল। মধ্যস্বত্বভোগী জমিদারের আয়ই এই তাবৎ শৌখিনতার ভিত্তি ছিল। (এ বিষয়ে জসীমউদ্দীন প্রণীত 'ঠাকুরবাড়ীর আঙ্গিনায়' গ্রন্থে সৌম্যেন্দ্রনাথ ঠাকুরের বক্তব্য দ্রষ্টব্য)

অবনীন্দ্রনাথের শিশুসাহিত্য এমনই আশ্চর্য ও মৌলিকতাঋদ্ধ যে সাহিত্যের কোন সংজ্ঞায়িত ক্ষেত্রেই তাদের ধরানো চলে না। তা যে শুধু শিশু-কিশোরদের জন্য বা এককথায় ছোটদের জন্য লেখা তা তো নয় তা যেন প্রতিটি মানুষকে সন্ধান দেয় এই ব্যস্ত, সাধারণ, চলমান পৃথিবীর মধ্যে নিত্য লুকিয়ে থাকা সেই শৈশবের সব সম্ভব অসম্ভবের ভেদ না থাকা বেড়াহীন, ভাঙাগড়ার ঝঞ্ঝাটহীন, বয়স্কের যুক্তি কারণ মানার দায় আর লাভের কাজের ব্যস্ততাহীন জগতটার। সেখানে 'ঘরের ধারে ডালিমগাছটি তাতে প্রভু নাচেন। নদীর ধারে জন্তী গাছটি তাতে জন্তী বড় ফলে'। সেখানে 'আখবাড়ীর পাশে, ভোঁড়শেয়ালী নাচে'। যেখানে 'পাঠাশালা নাই, গুরু নাই, গুরুমশায়ের হাতে বেত নাই'। আবার এই জগতের পাশাপাশি নালকের গল্পে বৌদ্ধযুগের কিশোরের সেই স্বপ্নদৃষ্টির জগত, চাঁইবুড়োর কাছে শকুনবিদ্যে শেখার উমেদার সেই বালক সবারই জগত যেমন জীবন্ত আবার একই সঙ্গে রামধনুর দেশের স্বপ্নের মত। সেই দেশে ও খাদ্য এসেছে নানা ভাবে কখনো প্রকৃত খাদ্যের রূপে আবার কখনো বা যাকে আমরা আধুনিক পরিভাষায় বলতে পারি 'কল্পখাদ্য' রূপে। 'নালকে' উদরক পণ্ডিত সিদ্ধার্থকে বলেছিলেন যে উদরই হল যাবতীয় অশান্তির মূল। তাকে ঠাণ্ডা রাখলেই আর দুঃখ আসে নয়া। সিদ্ধার্থ উদরককে প্রণাম করে সেই স্থান ত্যাগ করে যেতে যেতে দেখেন উদরকের সাতশো শিষ্য ভারে ভারে মণ্ডা নিয়ে আসছে গুরুর উদর শান্ত রাখতে। তবে সিদ্ধার্থ নিজেই শিষ্যদের জানান খাদ্যকে বাতিল করে শরীরকে যন্ত্রণা দিইয়ে নির্জীব করলে কোন কাজই সম্ভব নয়। দুঃখের শেষ খোঁজার চেষ্টা তো দূরের কথা।

'ক্ষীরের পুতুলে' ক্ষীরের রাজত্বে শুরুতে কিন্তু দুঃখিনী দুয়োরানীর দুঃখের কথায় রানী যেখানে ভাত পান না থালে। বনের ফল আর নদীর জল খেয়েই কাটাতে হয় দিন। বানর রাজাকে তাঁর খোকা হওয়ার কথা বলে মোহর নিয়ে রানীর জন্য গরম ভাত আর তপ্ত দুধের ব্যবস্থা করে। পরে রানীকে মহলে আনিয়ে চারিদিকে গড় কাটিয়ে রাজা প্রাসাদে এনে

রাখলে ছোটরানীর ষড়যন্ত্রে কালকূট বিষ মিশিয়ে গড়ে পাঠায় ক্ষীরের ছাঁচ, ক্ষীরের নাড়ু, মতিচুর মেঠাই। আবার ক্ষীরের জয়জয়কার। ষষ্ঠী ঠাকরুণ ক্ষীরের পুতুলের দুটি কান ঘুম পাড়ানি মাসিপিসিদের খেতে দেন। নিজে খান ক্ষীরের ছেলের বুক পিঠ মাথা, হাত আর পা। নিজের বেড়ালদের খেতে দেন ক্ষীরের পুতুলের দশটি আঙ্গুল। আর চুরি করে ক্ষীর হাওয়া বাঁদর হাতে নাতে ধরা পড়াতেই তো ষষ্ঠী ঠাকুর বাঁদরকে দেখতে দেন সেই রূপকথার সব পেয়েছির দেশ।

‘ভূতপতরীর দেশ’ অবন ঠাকুরের শ্রেষ্ঠ রচনা তাঁর যাবতীয় লেখার মধ্যে। পুরী থেকে কোনারক শেষ রাত্রে পালকিতে যাওয়ার যে স্মৃতি তাই কল্পনা আর ছবির মিশেলে রঙিন হয়ে এক কালজয়ী শিল্পসৃষ্টি করেছে। কত অদ্ভুত গল্প, চরিত্র আর বর্ণনার ভিড় এ কাহিনিতে তার ঠিক নেই। ইতিহাসের, পুরাণের, লোক কথার পুনর্নির্মাণ হয়েছে কি নিগূঢ় কৌশলে তা এক অবন ঠাকুরের ভাষাতেই বোঝানো সম্ভব। রয়েছে সাগরতলের অসাধারণ রূপকথার অপূর্ব প্রয়োগ। হারুন্দা (যে নাকি পূর্বজন্মে খলিফা হারুন অল রসিদ বোগদাদী) সে বর্ণনা করে ইস্পাহান আর কাবুলের বাগানের মানুষের মাথার মত বড় বেদানার গাছ, আর বেদানা, আখরোট, পেস্তা, খোবানি, আঙুর ভরা বিরাট মেওয়া বাগানের যার মধ্যে রেখে মেওয়া খাইয়ে নাকি অল্পবয়স্ক ছেলেদের বশ করা হয়। মাসির বাড়ি থেকে শাদা জুঁইফুলের মত ধবধবে খইয়ের মোয়া খেয়ে পেট ঢাক করে পিসির বাড়ী যাওয়ার পথে সাগরতল দিয়ে যাওয়ার সময় অবু দেখে পিসির খিড়কির পুকুরে কল কবজা দড়া বাঁধা বিরাট কাঁকড়ার দল যাদের পিসি কেঁচোর টোপ গেঁথে ধরছেন। আর আছে মস্ত মস্ত শুঁড়ওয়ালা গলদা চিংড়ি যাও পিসির ছিপে উঠেছে। দেখে পিসির রান্না কচি কুমড়ো দিয়ে কাঁকড়ার ঝাল, লাউ চিংড়ি আর গুড় অম্বল খেতে তার নোলা সকসক করে ওঠে। পিসির বাড়িতে গিয়ে সে উল্টো দেশে আসনে বসে পিঁড়ির উপরে রাখা কলাইয়ের ডাল আর কাঁকড়ার ঝাল দিইয়ে একপেট ভাত খায়। সাগরতলে যেখানে বিভিন্ন সামুদ্রিক ছত্রাক আর উদ্ভিদ যাদের দেখে অবু মনে করে ‘চেয়ে দেখি কেবল এ ছাতা আর তার নীচে এক একটা মুণ্ডু –গুটিসুতোর মত সোঁটা সোঁটা চুল আর মুলোর পাতার মত গোছা গছা দাড়ি। দূর থেকে মনে হচ্ছে যেন বিটপালং, গাজর, ওলকপি আর বিলিতি মুলোর ঝাঁকা সব উলটে পড়ে ভেসে যাচ্ছে’। তারপর এক জায়গায় সে দেখে ‘পিসির ধান ক্ষেত। এখানে কেবল মুক্তোকলাই।, দশবছর অন্তর একবার ফলে, আর তোমার পিসি সেই কলাইয়ের ডাল

দিয়ে পান্তাভাত দশবছর অন্তর একবার খান।...তোমাদের কলাইয়ের দাল-পাতলা-যেন জল। আমাদের এখানকার কলাইয়ের ডাল মুক্তোর মত ঝুরঝুরে'। বাস্তব আর কল্পবাস্তব, খাদ্য আর 'কল্পখাদ্য' কখন যেন মিলে মিশে এক হয়ে যায়।

'ভূতপতরীর দেশে' মানুষ (বা কল্পমানুষ) আর পশুপক্ষীর যে মিলিত জগত দেখতে পাই তার পরিপূর্ণায়ন দেখা যায় 'বুড়ো আংলা'য়। সেখানে পশুপক্ষীর এক অবাধ মেলা। পশুপাখির বিশেষ করে হাঁসেদের সাথে থেকে বুড়ো আংলা যখ 'রিদয়' (হৃদয়) ও তার মানুষ জন্মের খাদ্যাভ্যাস ভুলে পাখির খাদ্যাভ্যাসে রপ্ত হয়ে যায়। হাঁসেদের মতোই পাঁকাল মাছ কাঁচা খেতে তার দ্বিধা নেই। হাঁসেদের নেতা চকা নিকোবর রিদয়কে চেনায় কচি বেত খাওয়ার কথা যা নাকি আখের মতই মিষ্ট। পশুপাখিদের যে খাদ্যাখাদ্যের কত ভেদাভেদ আছে তাও আমরা এই কাহিনিতেই প্রথম জানতে পারি। বাংলা সাহিত্যে অখাদ্যের বর্ণনা এরকম একটি আলোচনাতেও খুবই গুরুত্বপূর্ণ হতে পারে এই রচনাটি। অবশ্য এতে মানুষের আহারের বর্ণনাও একেবারে দুর্লভ নয়। সুরেশ্বরের মোহান্তর জন্য বানানো মালপোয়া বা চাষীবউ এর পিঠেভাজার সেই ছ্যাঁকছ্যাঁক শব্দ আর গ্রামের ছেলেমেয়েদের পিঠের লোভে সেদিকে ছুটে যাওয়ার ছবিরও কোন অভাব নেই।

খাদ্যবিষয়ে অবনীন্দ্রনাথের কাল্পনিকতার আরেক রূপ তাঁর শেষ বয়সে লেখা 'মাসি' তে। 'জোড়াসাঁকোর ধারে'র কথকের বাল্যকাল এক অপূর্ব কল্পলোকের মিশেলে আবার কয়েকটি সত্যকারের পার্থিব চিত্রের মিশ্রণে এক অপূর্ব চিত্রশালায় পরিণত হয়েছে। মাসিকে বলা অবুর স্মৃতিতে আছে ফুকারী দাসীর কথা যে নাকি সরে ফুটো করে সেই ফুটো দিয়ে দুধ টেনে খেয়ে নিত। অবুকে দিত শুধু সর। খালি বাটিতে চুমুক দিতে গিয়ে অবু যদি জিজ্ঞেস করত দুধ কোথায় তাহলে সে উত্তর দিত যে গোয়ালা ফুকো দুধ দিয়ে গেছে। এবেলা অবু সরটুকুই খেয়ে নিক বিকেলে ফুকো দুধের চাঁছি সে খাওয়াবে অবুকে। আরো সে অবুকে জানায় যেন অবু এসব কথা মাসিকে না জানায় তাহলে দাসীরও চাকরী যাবে, গোয়ালাও আসবে না, দুধও পাওয়া যাবে নয়া, চাঁছিও পড়বে না। খাদ্য ও খাবার চুরি নিয়ে এহেন কল্পনা অবনীন্দ্রনাথের পক্ষেই সম্ভব। মাসিতে বারবার এসেছে অবুর মাসির কাছে খইমোয়ার আবদারের কথা। মাসির কাছে হারানো জোড়াসাঁকোর বাড়ির কথা শুনতে শুনতেই আবার অবু তোলে ফেলা বলে একটি মেয়ের কথা যে নাকি অবুদের বাড়ির সন্দেশ পছন্দ করে না।

বলে কেমন আটা আটা। তার মা যে সন্দেশ দেয় সে নাকি আরো ভালো। কেমন মিছরির মত।এই ফেলা্র উল্লেখ আছে 'জোড়াসাঁকোর ধারে'তেও। পুরোহিত বাসুন্তের কাছ থেকে কলার চোপা, শশার টিকলি, শাঁক আলুর টুকরো আর বেলের পানা খেতে খেতে অবু জিজ্ঞেস করে বাসুন্তেকে সে বাসুন্দে , ঝালুন্দেদের কেউ হয় কিনা। গুপ্তনিবাসে বসে অবু আবার যেন ফিরে যায় সেই জোড়াসাঁকোর ভূতপতরীর যুগে।

অবনীন্দ্রনাথের 'ছোটদের জন্য লেখা'গুলির প্রতিটির মূল (একমাত্র নালক ছাড়া ।এমনকি শকুন্তলার মালিনীর তীরে তপোবনও) এই বাংলাদেশ যেখানে 'ক্ষেত আর জলা, ক্ষেত আর জলা', যে দেশ 'কামধেনুর বাঁটের মত' ।তাঁর এই রচনায় যাবতীয় খাদ্যও তাই এই বাংলার। যা কিছু খাবার, যা খাবারের আকর্ষণ, আহারের লোভ সবই এই মাটির কোল ঘেঁষা। আর আকর্ষণও অতি পরিমিত, অতি সহজ , কোথাও নেই অতিরেক, কোথাও লোভ আনে না কোন মালিন্য। কোথাও আহারে দরকার নেই আড়ম্বর। বহু কঠিনের সারাৎসার আত্মস্থ করে অবনীন্দ্রনাথের যে 'সহজ' তাই ছড়িয়ে থাকে এই খাদ্যের বর্ণনাতেও। মাটির কোল ঘেঁষা, সহজ, সবল, অনায়াসলব্ধ অথচ সর্বত্র শিল্পশ্রীসুষমায় মণ্ডিত।

উপসংহার

অবনীন্দ্রনাথ ছিলেন সর্বঅর্থেই শিল্পী। তাঁর অন্তরের শিল্পীমন শুধু যে শিল্পসৃষ্টি করত তা নয় যেকোন সাধারণ ঘটনা ও জীবনযাপনের একোন সাধারণ বিষয়কে শিল্পে রূপান্তরিত করতে পারত। চৌষট্টিশিল্পের অন্যতম প্রধান শিল্প রন্ধন ও আহার যে এক্ষেত্রে সহজেই তাঁর শিল্পীদৃষ্টির আকর্ষণ লাভ করবে এ তো স্বাভাবিক। ঠাকুরবাড়ির যাপনকলাতেই রন্ধন-ভোজন খুবই গুরুত্বপূর্ণ স্থান নিয়েছিল। ৫ নং বাড়ীর বড়বাবু ও ছোটবাবুর হাতে এই ভোজনযাপন শিল্পরুচির শ্রেষ্ঠ ও সর্বাধিক উদ্ভাবনমূলক স্তরে পৌঁছেছিল। গগনেন্দ্রনাথ ও অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুরবাড়ির বিভিন্ন ভোজে যে সকল বিচিত্র আয়োজন ও অভিনব আয়োজন করেছিলেন সেগুলি রুচিসম্মত বিলাসে, অভিনব কল্পনাশক্তিতে ও শৈল্পিক সৃজনে ঝলমল করছে। দুঃখের বিষয় ড্রামাটিক ক্লাবের ভোজ বা গগনেন্দ্রনাথের বিশেষভাবে আয়োজিত অবনপুত্র অলোকেন্দ্রনাথের বিবাহভোজের মত কয়েকটি ব্যতিক্রমী ঘটনা বাদ দিয়ে বাকি এই ভোজগুলির বিবরণ হারিয়ে গেছে। এমনকি ঠাকুরবাড়ির সর্বাপেক্ষা জাঁকজমক হয়েছিল যাঁর বিবাহে সেই গগনেন্দ্রপুত্র গেহেন্দ্রনাথের বিবাহের ভোজের বিবরণও হারিয়ে গেছে। কিন্তু একথাও ঠিক যে এসব কিছুই জমিদারের আয় ও

শোষণের উপর ভিত্তি করে এবং এই আয়স্রোত রুদ্ধ হলে পাঁচ নম্বর বাড়িতে অনেকেরই অন্নাভাব দেখা দেয়। জসীম উদ্দীনের রচনায় আছে সমরেন্দ্রপুত্র ব্রতীন্দ্রনাথের ঢাকায় গিয়ে আক্ষরিক অর্থে অনাহারে থাকার কথা। এই বিপর্যয় রোধের সাধ্য তিন ভাইয়ের কারুরই ছিল না। অবনীন্দ্রনাথ তাঁর সমস্ত শিল্পসাধনায় তাঁর রবিকার মতই সহজ ও সুন্দরকে মেলানোর চেষ্টা করেছেন। খাদ্য, আহার ও রন্ধন এই ক্ষেত্রেও তাঁর বর্ণনা, পরীক্ষা ও প্রচেষ্টা অনায়াসসুন্দর। সে তাঁর সাহিত্যেই হোক বা যাপনচর্চায়।

তথ্যসূত্র

১। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অবনীন্দ্র রচনাবলী প্রথম খণ্ড, কলিকাতা , প্রকাশ ভবন, ১৯৫৪।

২। অবনীন্দ্রনাথ ঠাকুর, অননীন্দ্রনাথ ঠাকুর ছোটদের অমনিবাস, (সম্পা) লীলা মজুমদার, ক্লিকাতা, এশিয়া পাবলিশিং কোম্পানী, ১৯৭৯ (১৩৮৬ বঙ্গাব্দ)।

৩। অমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর (অনুলিখন মিতেন্দ্র গঙ্গোপাধ্যায়), অমিতকথা, কলকাতা, আনন্দ পাবলিশার্স, ২০১৮।

৪। অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুরে, 'ছবির রাজা ওবিন ঠাকুর' দ্রষ্টব্য সুধাংশুশেখর মুখোপাধ্যায় (সম্পা), অলোকেন্দ্রনাথ ঠাকুর রচনা সংগ্রহ, কলকাতা, গাঙচিল,২০১৮।

৫। উমা দেবী, বাবার কথা, কলিকাতা, মিত্রালয়।

৬। জসীম উদ্দীন, ঠাকুরবাড়ীর আঙিনায়, কলিকাতা, গ্রন্থপ্রকাশ।

৭। পূর্ণিমা দেবী, ঠাকুরবাড়ীর গগনঠাকুর, কলিকাতা, রামায়ণী প্রকাশ ভবন, ১৯৫৪ (১৩৬১ বঙ্গাব্দ)

৮। মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, দক্ষিণের বারান্দা, কলিকাতা, ইন্ডিয়ান অ্যাসোসিয়েটেড পাবলিশিং কোং, ১৯৭৩ (১৩৮০ বঙ্গাব্দ)।

৯।মোহনলাল গঙ্গোপাধ্যায়, গগনেন্দ্রনাথ, (সম্পা)পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায়, কলকাতা, দেজ পাবলিশিং, ২০১৩।

১০। রুশতী সেন, ঘুমের গঙ্গা বেয়েঃ অবনীন্দ্র-গগনেন্দ্র কথা, দ্রষ্টব্য সৌমিত্র চট্টোপাধ্যায় ও অশ্রুকুমার শিকদার (সম্পা) নির্বাচিত এক্ষণ দ্বিতীয় খণ্ডঃ প্রবন্ধ সংকলন, পৃষ্ঠা ৩৬১-৩৭২।

১১। সুমিতেন্দ্রনাথ ঠাকুর, ঠাকুরবাড়ীর জানা-অজানা, কলকাতা, মিত্র ও ঘোষ, ১৯৯৮(১৪০৫ বঙ্গাব্দ)।

১২। সৌদামিনী দেবী, পিতৃস্মৃতি, দ্রষ্টব্য পার্থজিৎ গঙ্গোপাধ্যায় (সম্পা) স্মৃতিকথায় জোড়াসাঁকো, কলকাতা, পত্রলেখা, ২০১১, পৃষ্ঠা ১৮-২৮।